Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 245 –252
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু প্রবাহ

Communal Riots, Partition and the Refugee influx into West Bengal

প্রনবেশ তালুকদার
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান
ইমেইল : t.pranabesh2010@gmail.com

Keyword
Riots, Refugee, Partition, Migration, Killing, Minority.

Abstract
The unprecedentedly violent communal riots that broke out in Bengal in August 1946 spread to other Indian Provinces, and the spate continued for about a year. The bloodshed that Calcutta witnessed during the few days of August 1946 has been infamously recorded in the memory and history of the city as the great Calcutta killing. The incidents of the Noakhali riots in East Bengal, on the other hand, were nothing short of a horror. A killing spree accompanied by plunder and abduction occurred across an area of about 200 square miles in Noakhali, and it led to an extremely panicked atmosphere in the district. The pattern of communal violence was similar everywhere in East Bengal, starting from Noakhali, Tipperah and Comilla to Dhaka and Chittagong – looting, forced conversion, abduction of women, killing characterised the violence everywhere. Consequently the anarchy and panic that ensued in East Bengal compelled many flabbergasted families to abandon their homes. Thus, the migration of refugees from East Bengal ensued even before independence and partition. And the relief camps for refugees were also setup during this period and continued to function well after partition. The problem of refugee influx and rehabilitation haunted India for several decades after partition. When communal riots once again broke out in Dhaka, Barisal and a few other districts in East Pakistan from 10 February 1950, a large number of Hindus from East Pakistan crossed the border to enter west Bengal. As contemporary records suggest, Hindus were the ones who suffered damage and deaths in this spate of riots. During the period between partition and mid-October 1948, a large number of refugees migrated to west Bengal. The next two large waves of migration occurred in the winter of 1950 and in the spring of 1952. According to an estimate done by the West Bengal government, about 250, 00, 00 displaced refugees migrated to West Bengal in early 1953. In 1962, after the massacre of minorities in Rajshahi and Pabna in East Pakistan, another 55,000 people got themselves officially registered to migrate to West Bengal. Another large-scale influx of refugees into West Bengal occurred in 1971. Although about 75, 00, 000 refugees migrated to West Bengal during this time, must of them went back to their native land in East Pakistan that eventually became Bangladesh.

Discussion

১৯৪৬-এর আগস্টে এক অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আন্দোলিত হয়েছিলো ভারতবর্ষ, সেটা চলেছিল এক বছরের মতো সময় ধরে। দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবসের দিন কোলকাতাতে, তারপর তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল নোয়াখালী, বিহার এবং অবশেষে পাঞ্জাবে গিয়ে রক্তাক্ত হানাহানির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, এই দাঙ্গাগুলিই এই উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যে ধারণা বদ্ধমূল করেছিল তা হল দেশ ভাগ অপরিহার্য, অধ্যাপক সুরঞ্জন দাসের মতো গবেষক একে 'partition riots' বলে অভিহিত করেছেন।[১] প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন থেকে কলকাতায় ঘটা নারকীয় এই হত্যাকাণ্ড, যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দাঙ্গায় কলকাতার যে সমস্ত জায়গাগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলি হল– রাজাবাজার, মির্জাপুর, কলেজস্ট্রিট, হ্যারিসন রোড সংলগ্ন এরিয়া, মানিকতলা, শিয়ালদহ এরিয়া, কলাবাগান এরিয়া, কুলাতলা-মুরগিহাটা এরিয়া, বউবাজার, ধর্মতলা, এন্টালী, মোটিয়াব্রুজ এবং টালিগঞ্জ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল।[২]

কলকাতার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও ভীতি খুব দ্রুত পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গসহ অবিভক্ত ভারতবর্ষের দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে, তবে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, কুমিল্লা, টিপ্পেরা (Tippera) প্রভৃতি অঞ্চল।

এই ভয়াভহ দাঙ্গা নিহতের সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ দাঙ্গাবাজেরা বহু মৃতদেহ লোপাট করেছিল, পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং নদীতে ফেলে দিয়েছিল, যার ফলে সঠিক কতজন এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন, তবে সরকারি রিপোর্ট, বিভিন্ন আধিকারিক ও সংবাদমাধ্যমের দেওয়া তথ্য থেকে অনেকটা অনুমান করা যায় প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা। ২২শে আগস্ট দ্য স্টেটম্যান পত্রিকার এক রিপোর্টারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৬ই আগস্ট থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত এই পাঁচ দিনে কলকাতায় নিহত এবং আহতের সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১৫,০০০ এর মতো।[৩] অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলির গভর্নর স্যার হেনরী টেনহ্যাম (Henry Twyanham) - এর বক্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় কলকাতার দাঙ্গার নিহতের সংখ্যা। ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর ইংল্যান্ডের লিভারপুলে রয়টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, কলকাতার দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে মাত্র চার হাজার। এবিষয়ে তিনি বলেছিলেন–

> "It is within my knowledge that least 4000 dead were counted in the streets of Calcutta and I believe more than that number were thrown into the Hooghly River."[৪]

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাতে নোয়াখালী ও টিপ্পেরা জেলা সব থেকে বেশি অত্যাচারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ, অপহরণ ও নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের নারীরা। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, টিপ্পেরা, কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম- সব জায়গাতেই আক্রমণের মূল চরিত্র ছিল এই ধরনের – লুঠ, ধর্মান্তরিতকরণ, অপহরণ এবং হত্যা। এরফলে পূর্ববঙ্গে যে অরাজকতা এবং ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে বহুমানুষ দিশেহারা হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন ত্রাণ-শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা-কবলিত নোয়াখালীকে শান্ত করার জন্য মহাত্মাগান্ধীও ছুটে গিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজকর্মীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। এই সময়ে দাঙ্গা বিধ্বস্ত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণ ও সাহয্যের জন্য বিভিন্ন বে-সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কলকাতা ও হাওড়াতে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলেছিল। এর ফলে স্বাধীনতা ও দেশভাগের আগেই শুরু হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদবাস্তু আগমন।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই বাংলা প্রদেশ স্থায়ী শান্তি ফেরাতে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এডিটরকে লেখা চিঠিতে সুচিন্তিত নাগরিকগণ বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছিল, হিন্দু-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে হিন্দু প্রভিণ্ডা গঠন করা হবে, যার রাজধানী হবে ক্যালকাটা, আর ঢাকা বা

চট্টগ্রাম হবে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশের রাজধানী।[৫] অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে দেশভাগ সম্পন্ন হয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহ মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলি চলে যায় পাকিস্তানের মধ্যে, নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পরে উদ্‌বাস্তু আগমন এবং পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষ বেশ কয়েক দশক সময় ধরে জর্জরিত ছিল। এই উদ্‌বাস্তু আগমন শুরু হয়েছিল ১৯৪৬-এর নোয়াখালী দাঙ্গার পর থেকে। এরপরে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর এক বিরাট সংখ্যক উদবাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গ থেকে এই বিরাট সংখ্যায় উদ্‌বাস্তু আগমনকে কংগ্রেস তথা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভালো চোখে নেননি। তিনি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের পালিয়ে আসার বিষয়টিকে কাল্পনিক ভীতি ও ভিত্তিহীন গুজবের ফল হিসাবে গণ্য করেছিলেন।[৬] নেহরু বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই অস্বাভাবিক উদবাস্তু আগমন বন্ধ হতে পারে একটি আন্তঃ ডোমিনিয়ন সম্মেলনের মাধ্যমে। তিনি ভেবেছিলেন পূর্ববঙ্গের অবস্থা স্বাভাবিক হলে উদ্বাস্তুরা আবার তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। সেই মতো ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ইন্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতে পাকিস্তানের মধ্যে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের মন থেকে মানসিক ভীতি দূর করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে 'মাইনরিটি বোর্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[৭] কিন্তু এই চুক্তি সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন ঠেকাতে পারলেও, সফল হয়নি। কারণ এই চুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার উদ্বাস্তু আগমন বেড়ে যায়। এই সময়ে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি প্রেসলেট ঘোষণা করেছিল যে, ২৫শে জুন ১৯৪৮ সালের পরে যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসবে সেই সকল ছিন্নমূল মানুষের 'উদ্বাস্তু' হিসেবে গণ্য হবে না বা তাঁরা নিজেদের 'রিফিউজি' হিসাবে নাম নথিভুক্ত করাতে পারবে না। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল যে, ওই সময়ে উদ্বাস্তুরা অর্থনৈতিক কারণে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছিল। তবে এটা সত্য ছিল যে, ইন্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্সের পরে যে উদ্বাস্তু প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, তার সময়ে সরাসরি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না। মূল কারণ বা ফ্যাক্টর ছিল আর্থ-সামাজিক। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, এই আর্থ-সামাজিক ফ্যাক্টর ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফলাফল।[৮] এই ঘোষণার পরে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা 'ফাঁদে পড়া জন্তুর মত'। কারণ, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে চাইলেও, এই ঘোষণা তাঁদের মধ্যে অন্য ধরনের ভীতির সঞ্চার করেছিল।

এর পরে ১৯৫০-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে বহু সংখ্যক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই সময়ের দাঙ্গা ছিল ভীষণ ভয়াবহ। এই দাঙ্গায় বলা হয় একতরফা ভাবে হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পাক-মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁর হিসাবে পূর্ববঙ্গের এই দাঙ্গায় বলির সংখ্যা ছিল মোট – ১০,০০০-এর কাছাকাছি।[৯] এই সময়কালে পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই পরিস্থিতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের নেতৃবৃন্দই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য ভারত সরকার পাক প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে লিয়াকৎ আলি খান ২ এপ্রিল (১৯৫০) দিল্লি পদার্পণ করেন। চারদিন আলাপ-আলোচনার ফলস্বরূপ ৮ই এপ্রিল একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে দুই বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই চুক্তিতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের জন্য একটি করে মাইনরিটি কমিশন গঠন করার কথাও বলা হয়, যার চেয়ারম্যান হবেন একজন করে মন্ত্রী। এছাড়া দু-দেশের সরকার দুজন সংখ্যালঘু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগ করবেন, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য।[১০]

ইন্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্স বা নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি কোন কিছুই পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন থেকে মানসিক ভীতি দূর করতে পারেনি বা পূর্ববঙ্গে স্থায়ী শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পারেনি। এর ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমনও বন্ধ হয়নি। দেশভাগের পর থেকেই ১৯৪৮ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বহু সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। এর পরে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু আসে ১৯৫০ সালের শীতকালে এবং ১৯৫২ সালের বসন্তকালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের শুরুর দিকে যে সমস্ত ছিন্নমূল মানুষ এদেশে

বসবাসের জন্য এসেছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি প্রায় ২৫০ লক্ষ, যার মধ্যে ২৫ লক্ষ ছিল এই ছিন্নমূল মানুষদের সংখ্যা। এইভাবে ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি দশ জন মানুষের মধ্যে একজন করে উদ্বাস্তু বা ছিন্নমূল মানুষ ছিল। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের উদ্বাস্তু আগমন না ঘটলেও ১৯৫৩ সালের পর থেকে কিন্তু উদ্বাস্তু আগমন থেমে থাকেনি। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল মোটামুটি ৩১. ৩২ লক্ষের মত। এরপর ১৯৬২ সালে রাজশাহী ও পাবনাতে সংখ্যালঘুদের হত্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরও ৫৫ হাজার মানুষ সরকারিভাবে নাম নথিভুক্ত করে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। তবে এই সংখ্যাটা কেবলমাত্র সেই সমস্ত উদ্বাস্তুদের যারা সীমান্তের চেক-পোস্টে পুলিশের কাছে তথ্য দিয়ে এসেছিল। কিন্তু যে সমস্ত মানুষের ১২০০ মেইল জনশূন্য পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল, সেইসব মানুষদের কোন সরকারি হিসাব নেই।

১৯৭১ সালের পুনরায় একটা বৃহৎ সংখ্যা উদ্বাস্তু আগমন ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। এই সময়ে মোটামুটি ৭৫ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছিল। যদিও তাঁদের অধিকাংশই আবার ফিরে গেছে। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য রয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল সেখানে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা দেখানো হয়েছিল মোটামুটি ৫৮ লক্ষ। এরমধ্যে ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ধরা নেই।[১১] যেহেতু তাঁরা আবার ফিরে গিয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমত, ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারির আগে পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে এসেছিল, তাদেরকে বলা হয়েছিল Displaced persons বা পুরাতন উদ্বাস্তু। আর ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারির পর থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ভারতে প্রবেশ করেছিল, তাদেরকে বলা হয়েছিল নব উদ্বাস্তু (Displaced persons)[১২] এর পরের দিকে আবার ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ যে সমস্ত মানুষেরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে এসেছিল, তাঁদেরকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথমত, যে সমস্ত উদ্বাস্তুগণ ১৯৪৬-এর অক্টোবর থেকে ১৯৬৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে এসেছিল, তাঁরা ওল্ড মাইগ্রান্টস্ হিসাবে পরিচিত হয়েছিল এবং যে সমস্ত উদ্বাস্তুগণ ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের মধ্যে এসেছিল, তাঁরা নিউ মাইগ্রান্টস্ হিসাবে পরিচিত লাভ করেছিল।[১৩] ১৯৪৯ সালের ১৮ই জুন পর্যন্ত পাওয়া আই. বি রিপোর্ট অনুসারে পূর্ববঙ্গ যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, তাদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চলে যে সব উদ্বাস্তুরা এসেছিল, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে ক্যাম্পে ছিল ১৮ হাজার ৩২৯ জন এবং ক্যাম্পের বাইরে ছিল ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ২০ জন উদ্বাস্তু। বাকী ২৩ জন উদ্বাস্তুকে অপরাধের জন্য আটক করে রানাঘাট এবং অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।[১৪] তাহলে ১৯৪৯ সালের ১৮ই জুন অব্দি পাওয়া তথ্য অনুসারে ক্যাম্পে বসবাসকারী মোট উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল = ১৮,৩২৯ + ৩৩,৭১৫ = ৫২ হাজার ৪৪ জন। আর ক্যাম্পের বাইরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯৫৬,২২০ + ৫,৮১, ০২০ = ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৪০ জন।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের অবস্থা ছিল খুবই দুর্বিসহ। ঐ সময়ে শিয়ালদহ স্টেশন ছিল মৃত্যুপুরী। স্টেশন চত্বর থেকে উদ্বাস্তুদের রানাঘাট, ধুবুলিয়াসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হত এবং তার জায়গায় শূন্যস্থান দখল করত নতুন আগত উদ্বাস্তুরা। ঐ সময়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। এছাড়া সন্তান-সম্ভবা নারীরাও খুব অসহায়ভাবে এই দূরাবস্তার মধ্যে পড়েছিল। প্রায়শই শোনা যেতো শিশু মৃত্যুর কান্না। সেই সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায় রাজ্যের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন এই ১৫ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। যখন তিনি দেখেছিলেন অন্য রাজ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র যে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সেই একই সাহয্য পাচ্ছে না এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য ত্রাণ কাঠামতে কেন্দ্রের দেওয়া আর্থিক সাহায্য অনেকটাই কম ছিল, তখন তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সময়ে রাজ্যের আর্থিক দুরাবস্থার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখা চিঠিতে ড. রায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।[১৫] ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬৩ টি কলোনি গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য। এর মধ্যে ১১৮ টি কলোনি ২৪ পরগণায়, ১৫ টি কলোনি নদীয়ায়, ১৩ টি কলোনি মুর্শিদাবাদে, ১১টি কলোনি জলপাইগুড়িতে, ৩টি কলোনি দার্জিলিং-এ, ২ টি কলোনি মালদহে, এবং ১ টি কলোনি পশ্চিম দিনাজপুরে গঠনের কাজ চলেছিল। ২৪ পরগনা জেলার ১১৮ টি কলোনি নিম্নোক্ত স্থানে গঠনের কাজ শুরু করা হয়েছিল – আলিপুর সদরে ১৯ টি কলোনি, ডায়মণ্ড হারবারে ১ টি কলোনি, বনগ্রামে ২৪ টি কলোনি, ব্যারাকপুরে ৩৫ টি কলোনি, বারাসাতে ২৪ টি কলোনি এবং বসিরহাটে ২৫ টি কলোনি ইত্যাদি। এছাড়া নদীয়াতে ১৫ টি কলোনির মধ্যে রানাঘাট মহকুমায় ১২ টি কলোনি এবং কৃষ্ণনগর সদরে ৩ টি কলোনি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। আর মুর্শিদাবাদের ১৩ টি কলোনির মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা সদরে ৭ টি কলোনি, জঙ্গিপুরে ৩ টি কলোনি এবং লালবাগে ৩ টি কলোনি গঠনের কথা বলা হয়েছিল।[১৬] কিন্তু সেই সময়ে প্রচুর সংখ্যায় উদ্বাস্তু আসার ফলে এই পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। ঐ সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের ভীর কমানোর জন্য কিছু ট্রানজিট উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – নদীয়ার রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প এবং ধুবুলিয়া ক্যাম্প। এই উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নবাগত উদ্বাস্তুদের আনা হত। তার পরে এই সব উদ্বাস্তুদের পেশা ও বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন নবগঠিত কলোনিতে পুনর্বাসন দেওয়া হত।

১৯৫০ সালের মধ্যে গঠিত কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবিরের বর্ণনা করলে, সেই সময়কার উদ্বাস্তুদের বাস্তবিক জীবনযাত্রার হাল-হকিকত কেমন ছিল – সেটা বুঝতে পারা যাবে। প্রথমেই আলোচনায় আসা যাক উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা নিয়ে। নদীয়ার ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে সাধারণ রোগীদের জন্য ৫০ টি এবং সংক্রামক রোগীদের জন্য ১০ টি বেড সম্বলিত একটি হাসপাতাল ছিল। উদ্বাস্তুরা এখানে এসে পৌঁছালে তাঁদের কলেরা ও বসন্ত রোগের টাকা দেওয়া হত। এছাড়া বসন্ত রোগীদের জন্য ২০ টি অস্থায়ী তাঁবুর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই শিবিরের হাসপাতালে একটি জরুরী বিভাগ ছিল, যেটি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকতো। এই সময়ে সাধারণ রোগীদের জন্য ৪০ টি বেড সহ একটি আন্তর্জাতিক রেডক্রস হাসপাতালও করা হয়েছিল এই উদ্বাস্তু শিবিরে। তাছাড়া ৫ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, কয়েকজন সহকারী এবং একদল ঝাড়ুদার এই শিবিরের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি নজর রাখার দায়িত্বে ছিলেন।[১৭] এই শিবিরে অনেক উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছিল বিভিন্ন রোগে ভুগে। ১৯৫০ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ এই তিন ধুবুলিয়ার দুটি উদ্বাস্তু শিবিরে ৬২৪ জন উদ্বাস্তু মারা গিয়েছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে ঐ মৃত্যু সংখ্যার হার প্রতি বছরে হাজারে শতকরা ৪০ জন। অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছরে হাজারে গড়-পড়তা ৩০ জন করে উদ্বাস্তু মারা যেত। উদ্বাস্তুদের মৃত্যু হার বেশি থাকার কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, এই সকল উদ্বাস্তু শিবিরে আসার আগে পথে তাঁদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তারফলে তাঁদের জীবনশক্তি অনেক কমে গিয়েছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদের উপর ঐ কষ্টের মাত্রা আরও বেশি হওয়ায় শিশু মৃত্যুর হার কিছুটা বেশি ছিল, এই শিবির দুটিতে।[১৮] টিটাগর ১ নং মহিলা উদ্বাস্তু শিবিরে একটি হাসপাতাল সহ একটি আউটডোর ডিসপেনসারি ছিল। এই হাসপাতালে সর্বক্ষণের জন্য একজন চিকিৎসক ও কম্পাউণ্ডার ছিলেন। টিটাগর ২ নং মহিলা উদ্বাস্তু শিবিরেও একটি হাসপাতাল ছিল। এখানে ২০ টি বেড ছিল। এই হাসপাতালে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত একজন লেডি ডাক্তার, চারজন নার্স, দুইজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ছিলেন।[১৯]

রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছিল উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য। এর আগে এই উদ্বাস্তু শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছিল কিছু মোবাইল ইউনিট, যারা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে উদ্বাস্তুদের টাকা ও ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে গিয়েছিল। এছাড়া এখানে কলেরা ও স্মল পক্স রোগীদের জন্য আলাদা একটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পে বহু উদ্বাস্তু কলেরা রোগে মারা গিয়েছিল, এছাড়া মার্চ মাস (১৯৫০) থেকেই ক্যাম্পবেল হসপিটাল রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন (Campbell Hospital Relief Association) তাঁদের ১২২ জন ডাক্তার কিছু সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে এই ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের

চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শুরু করেছিল। এসব ছাড়াও এই ক্যাম্পে মূমুর্ষ রোগীদের জন্য কিছু বাড়তি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন একজন সুপারিনটেনডেণ্ট, যাকে সহযোগিতার জন্য ছিলেন তিন জন অ্যাসিস্ট্যান্ট, দুজন স্টোরকিপার এবং ১৬ জন ক্লার্ক। এছাড়া একটা বৃহৎ সংখ্যক উদ্বাস্তু এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত।[২০] এই সময়ে শিবিরগুলিতে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পাঁচড়া ও চুলকানি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন শিবিরে অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনেক শিশু মারা গিয়েছিল। যে সমস্ত শিবিরে স্থায়ী হসপিটাল ছিল না, সেখানে একজন ডাক্তার এসে রোগীদের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু সেটা ছিল অপর্যাপ্ত। ফলে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু সঠিক চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছিল।

ঐ সময়ে সরকার বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বাস্তুদের নগদ অর্থ এবং চাল, ডাল ইত্যাদি প্রদান করেছিল। তবে বিভিন্ন শিবিরে দেওয়া ডাল ও খাবারের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রথমেই আসা যাক ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের কথা। এই উদ্বাস্তু শিবিরে ১৫ দিন অন্তর একজন প্রাপ্তবয়স্ক উদ্‌বাস্তুকে ২ টাকা নগদ অর্থ এবং একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্‌বাস্তুকে ১ টাকা ৬ আনা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হত। অন্যান্য সাহায্য হিসেবে এই শিবিরে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ২ সের ৭ ছটাক চাল ও ডাল এবং একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ১ সের ৩ ছটাক চাল ও ডাল দেওয়া হত। এছাড়া অতিরিক্ত সাহায্য হিসেবে এই শিবিরে পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের প্রত্যহ এক পোয়া দুধ এবং রোগীদের বার্লি প্রদান করা হত। উল্টোডাঙ্গা উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বাস্তুদের কোন নগদ অর্থ প্রদান করা হত না। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৩ ছটাক চাল এবং অ-প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দেড় ছটাক চাল বরাদ্দ ছিল। তবে এই শিবিরে রুগ্ন শিশু অথবা বয়স্কদের জন্য দুধ, বার্লি কিংবা চিরা-গুর এর ব্যবস্থা ছিল। এই শিবিরে রান্নার ব্যবস্থা ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনের তদারকিতে দু-বার ডাল ভাত দেওয়া হত।

মহলন্দী উদ্বাস্তু শিবিরে সপ্তাহে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ২ টাকা ও একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ১ টাকা ৬ আনা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হত। অন্যান্য সাহায্য হিসেবে এই শিবিরে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক সদস্যকে চাল ও আটা মিলিয়ে ২ সের ৭ ছটাক ও ৭ ছটাক ডাল এবং একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যকে চাল ও আটা সহ ১ সের সাড়ে ৩ ছটাক এবং সাড়ে ৩ ছটাক ডাল প্রদান করা হত। এছাড়া এই শিবিরে প্রত্যহ জমাট বাঁধা দুধ জল মিশিয়ে ছোট্ট শিশুদের এক পোয়া করে দেওয়া হত। কখনও কখনও প্রাপ্ত-বয়স্ক নারী ও পুরুষদের ১ খানা করে ধুতি ও শাড়ি প্রদান করা হত। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে সপ্তাহে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ২ টাকা এবং একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ১ টাকা ৬ আনা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হত। অন্যান্য সাহায্য হিসেবে এই শিবিরে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ২ সের ১০ ছটাক চাল ও ৭ ছটাক ডাল এবং একজন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্বাস্তুকে ১ সের ৫ ছটাক চাল ও সাড়ে তিন ছটাক ডাল প্রদান করা হত, এছাড়া ৫ বছরের নীচে শিশুদের চার ছটাক করে দুধ দেওয়া হত প্রতিদিন এই শিবিরে। সর্বপরি খুব দরিদ্রদের মাদুর, কম্বল, ধুতি, শাড়ি দেওয়া হত।[২১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির, মহালন্দী উদ্বাস্তু শিবির এবং রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের দেওয়া ডাল ও খাবারের ধরণ মোটামুটি একই ছিল বলা যায়। তবে উল্টোডাঙ্গা উদ্বাস্তু শিবিরে ঐ সময়ে উদ্বাস্তুদের কোনো নগদ অর্থ দেওয়া হয় নি। তাছাড়া ঐ উদ্বাস্তু শিবিরে রান্নার কোন ব্যবস্থা ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনের তদারকিতে অন্য জায়গা থেকে রান্না করা খাবার এখানে পরিবেশন করা হত। অনেক সময়ে খাবারের মানও খুব ভালো ছিল না। রান্না করা খাবার ছাড়া চিড়া মুড়ি জাতীয় জল-খাবারের কোনো ব্যবস্থা এখানে ছিল না। তাছাড়া দুপুরের রান্না করা খাবার পেতে বেলা ২ টো পেরিয়ে যেত। এর ফলে শিশুদের পক্ষে এত বেলা অবধি অভুক্ত থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এইসব কারণের জন্য এই শিবিরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে আমাশা রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি ছিল। এর পরবর্তী স্থান দখল করেছিল যথাক্রমে উদরাময় ও ম্যালেরিয়া।[২২]

এতদ সত্ত্বেও কিছু উদ্বাস্তু শিবিরে এই ক্যাশ ডাল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ায় উদ্বাস্তুরা প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। সর্বোপরি দীর্ঘদিন তাঁবুর মধ্যে বাস করা, অ-পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ বা অর্ধাহারের ফলে প্রত্যেক শিবিরে আশ্রয় প্রার্থীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল। এর উপর টাইফয়েড ও নিউমোনিয়ার প্রকোপ উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। এত কষ্ট সহ্য করেও উদ্বাস্তুদের মনোবল অটুট ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছিল যে, যদি

ভারত রাষ্ট্রে তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়, তবুও তাঁরা শান্তিতে মরতে পারবে। কারণ, তারা তাদের প্রিয় জন্মভূমির মায়া চিরতরে কাটিয়ে এসেছে। সুতরাং সেখানে তাঁরা আর ফিরে যাবে না। তাঁরা ভারত-রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে চেয়েছিল।[২৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের বলি পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু উদ্বাস্তুগণ অনেক আশা নিয়ে তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, এপার বাংলায় কোনরকম তাঁদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা সরকার করে দেবে। সেইকারণে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায় ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর থেকেই পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেও তাঁদের কষ্টের শেষ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পের স্যাঁত-সেঁতে ও অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁবুর ভিতরে বন্দী জীবন তাঁদের মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ঐ সময়ে উদ্বাস্তুগণ বাংলার মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। কারণ, উদ্বাস্তুরা ঠিক করেই নিয়েছিল যে, তাঁরা আর পূর্ববঙ্গে কোন দিন ফিরে যাবে না। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের এই মানসিক অবস্থাটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিবর্তে ত্রাণ ও সাহায্যের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুতরাং উদ্বাস্তুদের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল কংগ্রেস সরকারের উপর। ঠিক এই সময়েই ১৯৫০ সালের ১২ই আগস্ট সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তু হারা পরিষদ (ইউ. সি. আর. সি.) জন্মলাভ করেছিল। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন ও দাবী আদায়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের জন্য সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং উদ্বাস্তু সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার ও আন্দোলন গড়ে তোলা। এর ফলে ১৯৫০ সালের শেষ দিক থেকেই শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার উদ্বাস্তু আন্দোলন, যা তীব্রভাবে চলে গোটা পঞ্চাশের দশক জুড়ে। এইভাবে ইউ.সি.আর.সি. হয়ে উঠেছিল উদ্বাস্তু আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা মধ্যমণি।

তথ্যসুত্র :

১. Das, Suranjan, 'Communal Riots in Bengal 1905-1947', (OUP : 1993), p. 161
২. Amrita Bazar Patrika, 1946, 24 August, p. 6
৩. Staff Reporter, The statesman, 1946, 22 August, p. 1
৪. The pioneer, 1946, 10 October, p. 1
৫. The Statesman, 1946, 19 september, p. 4
৬. Chatterji, Jaya, 'The spoik of partition – Bengal and india, 1947-1967'; (CPU: 2018), p. 129
৭. Chakraborti, Prafulla k., 'The marginal men' (Lumiere books: 1990), p. 16-17
৮. Ibid, p. 18
৯. চন্দ্র সিংহ, ড. দীনেশ, '১৯৫০ : রক্তরঞ্জিত ঢাকা বরিশাল এবং', (প্রকাশক দেবজ্যোতি কর : জানুয়ারি ২০১২), পৃ. ৩৬
১০. Chakraborty, Saroj, 'My years with Dr. B. C. Roy' (sree saraswaty press limited: June 1982), p. 78
১১. R.R Committee's Report, Government of West Bengal, p. 1
১২. I.B. Report, secret, Govt. of W.B., File No. 1838/ 48, year- 1948, p. 959
১৩. Government of West Bengal, Manual of Refugee, Relief and Rehabilitation, vol – 1, p. 27
১৪. I.B. Report, secret, Govt. of W.B., File No. 1838/ 48, year- 1948, p. 526
১৫. Chakraborty, Saroj, p. 56

১৬. Staff Reporter, Ananda Bazar Patrika, 1950, 22 July, p. 4
১৭. Ananda Bazar Patrika, 1950, 27 August, p. 3
১৮. Ananda Bazar Patrika, 1950, 14 July, p. 5
১৯. Ananda Bazar Patrika, 1950, 14 September, p. 3
২০. Staff Reporter, The Statesman, 1950, 21 march, p. 10
২১. Ananda Bazar Patrika, 1950, 27 August, 6 september, 5 October.
২২. Ananda Bazar Patrika, 1950, 6 September, p. 4
২৩. Staff Reporter, Ananda Bazar Patrika, 1950, 5 October, p. 3